সম্পাদকীয়

বঙ্গবন্ধুর পেছনে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব এঁর অবদান

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মজুমদার

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য নাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অমর কবিতার নাম। আর সেই মহাকাব্য যিনি রচনা করেছেন, তিনি হলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে পরিবারের সহযোগিতা বিশেষ করে স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৩৩ সালের এই দিনে গোপালগঞ্জ জেলা টুঙ্গিপাড়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইতিহাসে বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেবল একজন সাবেক রাষ্ট্রনায়কের সহধর্মিণীই নন, বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অন্যতম এক নেপথ্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। মুজিব ভাই থেকে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু থেকে জাতির পিতা হয়ে ওঠার পিছনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হচ্ছেন বঙ্গমাতা। তিনি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর জেঠাতো বোন ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সে বাবা শেখ জহুরুল হক মারা গেলে দাদা শেখ আবুল কাশেম চাচাতো ভাই শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বিয়ে দেন । বঙ্গমাতার ডাক নাম ছিল রেণু। ফুলের মত গায়ের রং দেখে মা হোসনে আরা বেগম ডাকতেন রেণু বলে। সেই নামেই সবার কাছে পরিচিত হয়ে গেলেন। পাঁচ বছর বয়সে মা মারা গেলে শাশুড়ি মা সায়েরা খাতুন রেণুর চোখের পানি মাটিতে পড়তে দেননি। গভীর মমতায় নিয়ে এলেন নিজের ঘরে।

যেখানে নারীদের ঘরের বাইরে বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে পড়ালেখাতো কল্পনাই করা যেত না। তবুও তিনি দমে যাননি। সেই সময়ে ঘরে বসেই পড়ালেখা করেছেন। প্রতিষ্ঠানিক কোনো ধরনের বিদ্যা ছাড়াই তিনি ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন, জ্ঞানী, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, দায়িত্ববান ও ধৈর্যশীল। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়, তাঁদের বিয়ের ফুলশয্যা হয়েছিল ১৯৪২ সালে। বঙ্গবন্ধু ১৯৪২ সালে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুর সেই রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে বঙ্গমাতা নিজেকে যুক্ত করেন। বঙ্গমাতা নিজের গহনা বিক্রি করে ছাত্রলীগের সম্মেলনে টাকা দিয়েছেন। জীবন সংগ্রামের সব কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেও তিনি পরিবার সামলেছেন বেশ গুছিয়ে। সবকিছুর পরও তিনিই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতির শ্রেষ্ঠ ছায়াসঙ্গী। স্বৈরশাসক আইয়ুব সরকারের সময় রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে বঙ্গবন্ধুকে কারাবরণ করতে হয়। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে ছাত্রনেতা আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদসহ অন্যান্য ছাত্রনেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অর্থ ও পরামর্শ দিয়ে দলকে পরিচালনা করতেন।

বঙ্গবন্ধুর কারাবরণ অবস্থায় তিনি কাপড় সেলাই করে বাড়ি ভাড়া, সংসার চালানোর সবটাই তিনি করতেন। মাথা ঠান্ডা রেখে সবটাই তিনি সামলাতেন। সন্তানদের লেখাপড়া পাশাপাশি তাদের বাবার অভাবটা নিজের স্নেহ-ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতেন।বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব প্রসঙ্গে লিখেছেন রেণু খুব কষ্ট করত, কিন্তু কিছুই বলত না। নিজে কষ্ট করে আমার জন্য টাকা পয়সা জোগাড় করে রাখত, যাতে আমার কষ্ট না হয়। আর এক জায়গায় লিখেছেন, সে (রেণু) তো নীরবে সকল কষ্ট সহ্য করে কিন্তু কিছু বলে না। কিছু বলে না বা বলতে চায় না, সেই জন্য আমার আরও বেশি ব্যথা লাগে।

গোপালগঞ্জ জেলগেটে কথোপকথন সম্পর্কে বলেন, রেণু আমাকে যখন একাকী পেল বলল, ''জেলে থাকো আপত্তি নাই, তবে স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখো। তোমাকে দেখে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। তোমার বোঝা উচিত আমার দুনিয়ায় কেউ নাই । ছোটবেলায় বাবা-মামারাগেছেন,.. তোমার কিছু হলে বাঁচব কী করে?,. আমি বললাম, খোদা যা করেন তাই হবে, চিন্তা করে লাভ কী? বায়ান্ন থেকে একাত্তর অবধি সংগ্রামে বঙ্গমাতা বঙ্গবন্ধুর পেছনে ছায়ার মতো ছিলেন। চিরসংগ্রামী মুজিবকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আগলে রেখেছিলেন অপার মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে, সংগ্রামের সাহস দিয়ে। পৃথিবীর মানচিত্রে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। যারাই সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সঙ্গী হয়েছিলেন, বেগম মুজিব ছিলেন তাদের সর্বাত্মক প্রেরণার উৎস।

১৯৬১ সালের ১ অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে ওঠেন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। এরপর এ বাড়ি-ই পরিণত হয় নেতাকর্মীদের আপন ঠিকানায়। এখান থেকে পরিচালিত হয় দলীয় ও মুক্তিযুদ্ধের দিক-নির্দেশনামূলক নানা কার্যক্রম। রাত-বিরাতে ৩২ নম্বরে অযুত ছাত্রনেতা কিংবা রাজনৈতিক কর্মীদের নিজের হাতে রেঁধে মায়ের স্নেহে, বোনের মমতায় পাশে বসে খাইয়েছেন বেগম মুজিব। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে দুইটি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বঙ্গমাতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামী করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করা হয়। এমনকি বেগম মুজিবকে গ্রেফতার করার হুমকিও দেয়া হয়। সে সময় বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য তীব্র আন্দোলন সংঘটিত হয়। পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে লাহোরে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানায়। বেগম মুজিব জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে প্যারোলে মুক্তি নেয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানান। তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হবে। সত্যি সত্যিই গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয় এবং পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু মুক্তি লাভ করেন। পরের দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি বাঙালি তাদের প্রিয় নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দিয়ে বরণ করে নেয়। সে সময় ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন জনাব তোফায়েল আহমেদ। তোফায়েল আহমেদের মুখে প্রথম উচ্চারিত হয়েছিলো 'বঙ্গবন্ধু'। সেই থেকে শেখ মুজিব বাঙালির দেয়া খেতাব বঙ্গবন্ধু-তে পরিণত হন। বেগম মুজিব প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে জোড়ালো আপত্তি না করলে পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হতো না। আমরা প্রায় সবাই ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু ভাষণের কথা জানি। রাজনৈতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর উপর স্বাধীনতা ঘোষণার একটি চাপ ছিলো, অন্যদিকে পাকিস্তান সরকারের কড়া দৃষ্টি ছিলো। আমারা অনেকেই জানি সেই ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে মাথার উপর সুসজ্জিত হেলিকপ্টার ঘুরছে, আর মঞ্চের চারপাশে সাদা পোশাকে পাকিস্তানী আর্মি বঙ্গবন্ধুর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। সকল বাঙালি স্বাধীনতার ঘোষণা চেয়েছিলো। অথচ বঙ্গবন্ধু তখন স্বাধীনার ডাক দিলে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত হতেন। এমন একটি সময় বেগম মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করেন নি। বেগম মুজিব জনতার দিকে তাকিয়ে এবং সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে মন থেকে যা বলতে ইচ্ছা করে তাই বলার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শের যথার্থ প্রতিফলন দেখা যায় ঐতিহাসিক এ ভাষণে। বঙ্গমাতা উল্লিখিত দু'টি ঘটনায় প্রত্যক্ষ অবদান যদি না রাখতেন, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো।

বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানি দুঃশাসনের নাগপাশ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশকে উদ্ধার করেছে, যা সম্ভব হয়েছিল মহীয়সী নারী বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের অনুপ্রেরণায়। বেগম মুজিব জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন একাকী কিংবা দলীয় নেতাকর্মীদের দিকনির্দেশনা দিয়ে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের মধ্যে যখনই কোনো সংকটের কালো ছায়া ঘনীভূত হয়েছে, বেগম মুজিব সেই কালো ছায়া দূর করার জন্য পর্দার অন্তরাল থেকে দৃঢ়, কৌশলী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গমাতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, '' জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত (বঙ্গবন্ধুর) পাশে ছিলেন, যখন ঘাতকেরা আমার বাবাকে হত্যা করল, তিনি তো বাঁচার আকুতি করেননি। তিনি বলেছেন, 'ওনাকে যখন মেরে ফেলেছ, আমাকেও মেরে ফেল'। এভাবে নিজের জীবনটা উনি দিয়ে গেছেন। এভাবেই বঙ্গবন্ধুর জীবনের সুখ-দুঃখেরসাথি হয়েই শুধু নয়, মৃত্যুতেও সাথি হয়েছিলেন তার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব।

বাঙালি জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি ধাপে ধাপে বেগম মুজিবের অবদান বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী হিসেবে নয়, প্রধানমন্ত্রীর মাতা হিসেবে নয়, একজন নীরব দক্ষ সংগঠক হিসেবে, যিনি ধুপের মতো নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছেন এবং বঙ্গবন্ধুকে হিমালয়সম আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট নিজ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শাহাদত বরণ করেন তিনি।

লেখকঃ টেলেক্স অপারেটর, পিআইডি, চট্টগ্রাম।

আল কোরআন ও হাদিসের বাণী

আল কোরআন

৩৩. তুমি ঘোষণা করে দাও, 'আমার রব নিশ্চয় হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসঙ্গত বিদ্রোহও এবং আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে শরীক করা, যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলিল-প্রমাণঅবতীর্ণ করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।

৩৪. প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে তখন তা এক মুহূর্তকালও আগে কিংবা পরে হবে না।

আল হাদিস

৪৪ নং পরিচ্ছেদ

অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ হরণকারী হত্যাযোগ্য অপরাধী, হরণকালে নিহত হলে দোযখবাসী, নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ

৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা)-কেবলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে মারা যায়, সে শহীদ। (বুখারী-কিতাবুলমাযালিম)

জনশক্তি রপ্তানি

নতুন কর্মক্ষেত্র খুঁজতে হবে

করোনা মহামারির কারণে দীর্ঘসময় বন্ধ থাকার পর নতুন করে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি শুরু হয়েছে। গত ডিসেম্বরের শুরুর দিকে বাংলাদেশ থেকে সব পেশার কর্মী নেওয়ার ঘোষণা দেয় দক্ষিণ কোরিয়া। পরে দুই দেশ একটি সমঝোতা স্মারক সই করে। এ বছর দক্ষিণ কোরিয়ায় যাচ্ছে রেকর্ডসংখ্যক বাংলাদেশি কর্মী। এরইমধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে দুই হাজার ৫৯৪ জন বাংলাদেশি কর্মী দেশটিতে গেছে। ঢাকায় দক্ষিণ কোরিয়া দূতাবাস জানিয়েছে, এ বছর 'এমপল্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম' বা ইপিএসের আওতায় তিন হাজার ৬০০ জনেরও বেশি বাংলাদেশি কর্মীর দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার এ বছর বাংলাদেশের জন্য এক হাজারের বেশি অতিরিক্ত পারমিট বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলে ২০০৮ সালে দুই দেশের ইপিএস কর্মসূচি শুরুর পর এটি হবে সর্বোচ্চ সংখ্যা। দক্ষিণ কোরিয়া সরকার তাদের শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে